সীমান্ত -কথা -২

(পুর্ব সংখ্যার পর)

মখদুম আজম মাশরাফী

সেকালে বাংলার সাংস্কৃতিক স্পন্দন কলকাতা থেকে পৌছাত জলপাইগুড়িতে। আর শিহরিত, উদ্বেলিত করে যেতো ডোমারের অঙ্গন। এ জন্যে ডোমারের ছিল এক বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক প্রকরন। ডোমারে ছিল এক বিখ্যাত উৎকৃষ্ট মানের পাবলিক লাইব্রেরী। এটির গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইন্টারনেটহীন সে যুগে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর ছিল নাট্যমঞ্চ ও সাংস্কৃতিক মিলনায়তন। এগুলি ছিল ডোমারের সংস্কৃতিবান মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বলা যায় তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় হিন্দু ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সংস্কৃতি সেবীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সবার ছিল সমান অংশীদারিত্ব। বাংলা খন্ডিত হলে সম্মানিত হিন্দু ব্যক্তিত্ব চলে যান ওপারে। আর তার দুদশক পরেও ছিল এগুলির উৎসাহিত চর্চা যতদিন ঐ প্রজন্মের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিবান যারা এপারে বেঁচে ছিলেন। ছেলে বেলায় দেখিয়ে তোরঙ্গ ভর্তি জরিখচিত রাজা, সম্রাটের নাট্যমঞ্চের পোষাক, মুকুট ও তলোয়ার, আর রাজকীয় পাদুকা। মঞ্চ সজ্জায় বিচিত্র আকারের আর রঙ্গের বিপুল বস্ত্র সম্ভার। নিম্নমুখী বিশেষ ধরনের হেচাক বাতি যা রশী দিয়ে ওপর থেকে ঝুলিয়ে টাঙ্গানো হত মঞ্চ আলোকিত করার জন্য। তখন কোন বিদ্যুত ছিল না। আমার দাদু শ্রেণীর ব্যক্তিদের সিরাজুদ্দৌলা, শাহজাহান পরে পাথর বাড়ী, ময়ূর মহল ধরনের নাটক মঞ্চায়ন করতে দেখেছি। মজার ব্যাপার হল ছেলেরা তখন মেয়েদের ভুমিকায় অভিনয় করতেন।

সেই উত্তরাধিকার সূত্র ধরে, আমাদের কৈশোর ও প্রারম্ভ যৌবন ও উদ্বেলিত ছিল সেই সাংস্কৃতিক রসের আনন্দ অবগাহনে। মনে আছে হলদিবাড়ীতে নাটক দেখে সেখ্নকার স্কুল শিক্ষক জীতেন বসাকের একটি নাটক আমরা ডোমারে ম্ঞস্থ করেছিলাম। স্কুলজীবনে ডোমারে আমরা নিয়মিত নাটক, সাংস্কৃতিক-সাহিত্য অনুষ্ঠান করতাম। তিনটি প্রধান গোষ্ঠির মধ্যে চলতো মানের প্রতিযোগিতা। এগুলির নাম ছিল 'বাংলা নিকেতন', 'বাংলার মুখ' ও 'গীতছন্দ'। আমরা সেকালেই প্রথম শুরু করি মেয়ে চরিএে মেয়েদের অভিনয়। ঐ উত্তরসূরীরা অনেকটা হাত ধরে এই সুকুমার পথে আমাদের চলতে শিখিয়েছেন। সে কথা অন্য সময় আবার বলা যাবে।

আর স্বাদেশিকতা? সে তো সবারই জানা। তেভাগা আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহের সংগঠক ও শহীদ তন্নারায়ন ও চাটিষার মত মানুষের উদ্দীপিত পদচারনা ছিল আমাদের অঞ্চলের গণমানুষের প্রাণের দ্যোতনা। অখন্ড বাংলার 'প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডোমারে, ১৩ই পৌষ, ১৩৫২ সালে। সেই দেয়াল লিখন ভারত বিভক্তির প্রায় দু'দশক পরেও বড় বড় কালো হরফে উৎকীর্ণ ছিল প্রধান বাজার এর একটি সুউচ্চ বিশাল আড়তঘরের টিনের দেয়ালে। প্রখ্যাত স্বদেশবাদী সত্যেন সেনের 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' গ্রন্থে বর্নিত আছে ডোমারের সেই অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের ইতিহাস।বাংলার এপার ওপার ছিলনা তখন। এ অঞ্চলের

মানুষ তখনও একিভূত ছিল জলপাইগুড়ি, কলকাতার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আর রাজনীতির সূত্রে।

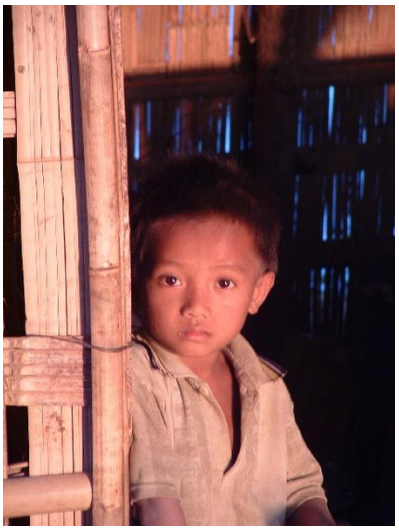

আমার দাদুরা ছিলেন দু-ভাই আর চাচাতো ভাই ছিলেন তিনজন।এরা সবাই 'ধনী পাড়ার'। আমার দাদুর চাচাতো ভাই ছিল বয়সে বড়। তিনি ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের 'প্রেসিডেন্ট'। এখন যাকে বলা হয় চেয়ারম্যান। ইংরেজ আমলে সেকালে এই ছিল প্রাথমিক প্রশাসনিক কাঠামোর রুপ। আমার দাদু ছিলেন সেই প্রেসিডেন্ট আয়ের প্রধান ও নির্ভরযোগ্য সহকর্মী। অনেকটা রামের লক্ষনের মত। দাদুকে দেখিনি। ছবিতে তিনি দীর্ঘ দেহী, শ্যামলবর্ণ, বিশাল মানুষ। শেরওয়ানী ফেজ টুপি আর ধুতিতে তার চেহারায় ছিল তেজোদ্দীপক বিশিষ্ঠতা। সামাজিক দায়িত্বকে খুব বড় করে দেখতেন এরা।

অন্যদিকে, বানিজ্যক্ষেত্রে আগেই বলেছি প্রধানতঃ মাড়োয়ারীরা নিবেদিত ছিল।আর সংস্কৃতিক্ষেত্রে ছিল অনেকের মত আমাদের পরিবারের অগ্রসর ভুমিকা। আমার ফুফুরা ভাল গান গাইতেন। আমার জ্যাঠা ও চাচারা ভাল বাঁশী বাজাতেন। রংপুরের বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক কালে যখন নারীদের "অবরোধ বাসিনী" করে রাখা হত, সেকালেও মুক্ত সাংস্কৃতিক চিন্তার চর্চা ছিল ডোমারে খোদ আমাদের ধর্মপ্রাণ পরিবারেই।আমার দাদুরা ছিলেন ভূস্বামী, ধর্মপ্রাণ এবং উদার মানুষ। এ জন্যেই আমাদের পরিবারে তা সম্ভব হয়েছিল। ডোমার অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বাতাবরন নিঃসন্দেহে এই মুক্তচিন্তার জাতক ও লালক ছিল। আব্বার ছিল ৬ ভাই ও ৫ বোন। দাদু তার বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বলরামপুর কুচবিহারে, যেন নাইওর আনতে পারেন যখনই দেখতে ইচ্ছে হবে মেয়েকে। সেই জামাতার নাম সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দিন। দাদুর মৃত্যুর পর পরিবারের সবচেয়ে জৈষ্ঠ সন্তান হিসাবে বাকী ভাই বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে আব্বার ওপর। তিনিও বোনদের বিয়ে দেন কাছাকাছি অঞ্চলে। এক বোনের দিনাজপুরে, আরেক বোনের ১৫ মাইলের ব্যবধানে নীলফামারীর কালিকাপুরে কোরবান আলী চৌধুরীর সাথে, আরেক জনের বিয়ে দেন ১০ মাইল দুরত্বে পাশের জেলা কুচবিহারের হলদিবাড়ীতে কবিরউদ্দিন প্রধানের সাথে। অন্যজনের ৩ মাইলের দুরত্বে খাটুরিয়ায়। পরে ভারত বিভাজনের সীমান্তরেখা খন্ডিত করে আমাদের পরিবারকেও। ১০ মাইলের দুরত্বে ওপারে সীমান্তের মাত্র ১ মাইলের মধ্যে পড়ে আম্মার এক ফুফুর বাড়ী। এভাবে বদলে গিয়েছিল সবকিছু। যে রংপুরে ঢাকা ছিল অজানা ও সুদুর তা হয়ে গেল গন্তব্য। আর যা ছিল নিকট ও সুগম্য তা হয়ে পড়ল সুদুর ও অগম্য। বাংলার সেকালিন সুদিনগুলি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু অনুধাবন করতে পারি তারপরের সেই রক্তাক্ত সহিংস দিনগুলির ইতিহাস। উন্মুল, উদ্বাস্তু মানুষের সারি, এপার থেকে ওপারে আর ওপার থেকে এপারে। গৃহদাহ, আক্রমন, হত্যা, লুণ্ঠন, কান্না, হাহাকার,

নিগ্রহ, স্বজন হারানোর আহাজরি, নিঃস্ব শূণ্যহস্ত জীবনের অভিঘাত। অন্যদিকে পতাকা বদল, বক্তৃতা, উল্লাসধ্বনি, নতুন স্বপ্ন, প্রতিশ্রুতি ও আশান্বিত আবেগ।

দেশভাগের সেই উদ্ভ্রান্ত, উন্মাদ চুড়ান্ত সময়ে আমার বড় ফুফু ছিলেন কলকাতায় স্বামী ও দুটি শিশু সন্তান নিয়ে। আপাদমস্তক সংস্কৃতিবান, ধর্মশালীন, সহিষ্ণু ফুফুআম্মার মুখে শুনেছি কলকাতার ধর্ম-দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শীর উন্মত্ত সে কাহিনী। চিরকালীন বিভক্তি বিরোধী আব্বাসউদ্দিন ও তার আরও তিন ভাই ভূ-স্বামী পিতার সহায়, সম্পদ, আবাসগৃহ যতটুকু সম্ভব অন্য আরেকজন দেশ ত্যাগী হিন্দু পরিবারের সাথে বিনিময় করে চলে এসেছেন ঢাকায়। কিন্তু হলদীবাড়ীর ফুফু ও তার স্বামী সন্তানেরা পিতৃপুরুষের মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন। স্রেফ গ্রাম ভিত্তিক ভূ স্বামী বর্গাদারের চেয়ে বড় ছিল তার গণ-মিশ্রণ ভুমিকা। তাই একদিকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অন্যদিকে তিনি ছিলেন সে এলাকার আজীবন নির্বাচিত পঞ্চায়েত। ৭১ এ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বিপুল শরনার্থী সমাবেশ ঘটলে সাময়িক মুসলিম বিরোধী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় অঞ্চলে। আমি নিজে দেখেছি তার হিন্দু বর্গাদার প্রজারা তার হলদীবাড়ীর বাড়ী ঘিরে রেখে তাকে রক্ষা করেছিল সেই উত্তেজনাকর বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে। সে কথাও অন্য সময় বলা যাবে।

ডঃ মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া

ক্রমশ চলবে - - - - - - - - - -